বিজ্ঞানমনস্ক ধারা ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে

ইরতিশাদ আহমদ

বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের সহাবস্থান

একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া,
জনম ভইরা চলতে আছে
– আবদুর রহমান বয়াতী

বিজ্ঞানচর্চা বনাম বিজ্ঞানমনস্কতা

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কি দ্বিতীয় বছরে আমাদের রসায়নের একটা কোর্স নিতে হয়েছিল। কোর্সটা যিনি পড়াতেন, তিনিই ছিলেন পাঠ্য বইটার লেখক। বইয়ের ভূমিকায় শেষাংশে স্যার সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে লিখেছিলেন, অণু-পরমাণু-ইলেক্ট্রন-নিউট্রন-প্রোটনের জটিল জগত সম্পর্কে তিনি যতই জেনেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার ক্ষমতার এবং বুদ্ধিমত্তার যে সীমা-পরিসীমা নেই তা উপলব্ধি করে ততই অভিভূত হয়েছেন। সৃষ্টির অপার রহস্য জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যতই তার কাছে উন্মোচিত হয়েছে ততই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে। তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন, রসায়নশাস্ত্রে পন্ডিতও ছিলেন। কিন্তু এই ধারায় যারা চিন্তা করেন, বিজ্ঞানী হলেও কি তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যায়? যে বিজ্ঞানগ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন, যে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পদ্ধতির বর্ণনা তিনি নিজেই তার লেখা বইতে দিয়েছেন, তার তোয়াক্কা না করেই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং এর অন্তর্ভুক্ত সবকিছুর নিয়ামক আল্লাহতালা নামক একজন সৃষ্টিকর্তা। যে জ্ঞান তিনি বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অর্জন করেছেন সেই জ্ঞানকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের শুধু নয়, তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তার এই ধারণার ভিত্তিতে আছে বিশ্বাস, কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নয়। এই স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা কি?

যদি রসায়নবিদ না হয়ে আমাদের শিক্ষক একজন অশিক্ষিত কৃষকও রয়ে যেতেন, তাহলেও খুব সম্ভবতঃ তিনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একজন পরহেজগার বান্দা হয়েই থাকতেন। প্রতিদিন নিয়মমাফিক সকালে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখে দেখে রুজি-রোজগারের মালিক খোদাতালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেন। গাছের ফল, ক্ষেতের ফসল আর নদীর জল-মাছ পেয়ে হয়তো গেয়ে উঠতেন, 'এই সুন্দর ফুল, এই সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানী।' সবাই তো আর আরজ আলী মাতুব্বরের (১৯০০-১৯৮৫)[১] মতো প্রশ্ন তোলেন না, "আমি কে? খোদা কি মনুষ্যভাবাপন্ন? কেন তাঁহাকে ধর্মযাজকগণ পার্থিব মানুষের ও তাদের কার্যকলাপের সাথে তুলনা করিয়া জনসাধারণকে বুঝ দেয়ার প্রয়াস পান?"

দেখা যাচ্ছে, সারাজীবনের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং চর্চা আমাদের কেমিস্ট্রি স্যারকে তার আজন্মলালিত ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তিতো দেয়ইনি, বরং আরো বেশী করে ধর্মের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যদিও বিজ্ঞান প্রশ্ন না করে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সদুত্তর না পেলে কোন কিছুই মেনে না নিতে শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন বিজ্ঞানচর্চাকারীর মনে বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের এহেন সমন্বয় কিভাবে সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি দীর্ঘ দিন ধরে বটে, কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের সহাবস্থান দেখে দেখে অযৌক্তিক মনে হলেও একেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি একসময়। মেনে নিয়েছি যে, বিজ্ঞানী হওয়া আর বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া এক কথা নয়। বিজ্ঞানচর্চা করে বিজ্ঞানী হওয়া যায়, কিন্তু মুক্তবুদ্ধির চর্চা না করলে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না। তাই দেখি, বাংলার অধ্যাপক হয়েও একজন মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে পরিণত হন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষে, আর একজন বিজ্ঞানী সারাজীবন বিজ্ঞানচর্চা করেও রয়ে যান ধর্মাচ্ছন্ন। ধর্ম টিকে থাকে বিশ্বাসে, বিজ্ঞান বিকশিত হয় সংশয়ে; ধর্মের ভিত্তি ঈমানে, আর বিজ্ঞানের মূল সাক্ষ্যপ্রমাণে।

আমেরিকায় আসার পরে এখানেও দেখেছি আপাতদৃষ্টিতে যাদেরকে আধুনিক, চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর, উচ্চশিক্ষিত, কুসংস্কার-মুক্ত বলে মনে হচ্ছে সেই আমেরিকানদের মধ্যেও অনেকেই রয়েছে যারা আক্ষরিক অর্থেই আদম-হাওয়ার গালগল্পে বিশ্বাস করেন। ছয় হাজার বছর আগে ছয়দিনে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, বিনা প্রশ্নে এধরণের আজগুবি কথাকে পরম সত্যি বলে মানেন। এদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর বা বিশ্বস্রষ্টা লম্বা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ়বয়সের একজন পুরুষ।

এই ধরণের চিন্তার মূল হেত্বাভাস (ফ্যালাসি) হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষ নিজের অজান্তেই সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের সীমাবদ্ধতার নিরীখে তুলনা করে। ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে এই ধারণা যে, ভগবান বা আল্লাহ বা ঈশ্বর সব বিজ্ঞানীর সেরা বিজ্ঞানী, সব ইঞ্জিনীয়ারের সেরা ইঞ্জিনীয়ার, সব শিল্পীর সেরা শিল্পী, সব ভাস্করের সেরা ভাস্কর, সব গ্রন্থকারের সেরা গ্রন্থকার। মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার সৃষ্টিশীলতায় আর মননশীলতায়। তাই মাইকেলএঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সৃষ্টিশীলতায় আর আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথের মননশীলতায় আমরা হই বিস্ময়াভিভুত। বিজ্ঞানে, প্রকৌশলে, স্থাপত্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আমাদের চিত্ত হয় শ্রদ্ধায় অবনত।

এমন কি একজন ঘড়ির কারিগরও হয়ে যান আমাদের প্রশংসার পাত্র। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীরা ঘড়ির সাথে সৃষ্টির তুলনা করতে খুবই পছন্দ করেন। কারন ঘড়ির ডিজাইনার ঘড়ির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলার সামর্থ্য ঢুকিয়ে দেন, বা 'চাবি মাইরা ছাইড়া দেন' যা চলতে থাকে 'জনমভর'। যা চলছে, তা কেউ না কেউ চালিয়ে দিয়েছেন, এই ধরণের চিন্তা করতেই আমরা বেশি অভ্যস্ত।

প্যালির ঘড়িতত্ত্ব

ঘড়িতত্ত্বের জনক হচ্ছেন উইলিয়াম প্যালি (১৭৪৩- ১৮০৫)[২] নামের একজন ধর্মযাজক। প্যালির *Natural Theology – or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature* প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। প্যালি লিখেছেন,

> "আমরা যখন একটা ঘড়ির ভিতরটা ভালভাবে পরীক্ষা করি, আমাদের মনে ধারণা জন্মে যে, এর বিভিন্ন অংশগুলির একটার সাথে আরেকটাকে যুক্ত করা হয়েছে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে মনে রেখে। এই অংশগুলিকে বানানো এবং লাগানো হয়েছে এমনভাবে যাতে এর মধ্যে গতির সঞ্চার হয়, এবং সেই গতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যাতে ঘড়িটা দিনের ঘণ্টানুযায়ী সময় নির্দেশ করতে পারে। যদি, এর বিভিন্ন অংশগুলি ভিন্ন আকারের হতো, অথবা যদি সেগুলো অন্যভাবে একটা আরেকটার সাথে যুক্ত থাকতো, তাহলে এই যন্ত্রটার মধ্যে কোন গতির সঞ্চার হতোনা, বা হলেও যে সময় নির্দেশ করার জন্য এটাকে বানানো হয়েছে ঘড়িটা তা করতে পারতো না ... আমরা অবধারিত ভাবেই ধরে নিতে পারি, ঘড়িটাকে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বানিয়েছে, কোনও না কোন সময়ে, কোথাও না কোথাও, এক বা একাধিক নির্মাতা, এর নির্মান এবং ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনা করেই এটাকে বানিয়েছে একটা বিশেষ কাজ করার জন্য, আর তা হচ্ছে সময় নির্দেশ করা"।

এই হচ্ছে প্যালির অকাট্য যুক্তি; ধোঁয়ার পেছনে যেমন থাকে আগুন, তেমনি প্রত্যেকটা ঘড়ির পেছনে আছে কারিগর, আর তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মান্ডেরও আছে এক নির্মাতা! মজার ব্যাপার, প্যালি বইয়ের নামে 'এভিডেন্স' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কোন কিছুর সত্যতা দাবী করতে হলে যে, প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্য বা এভিডেন্স দরকার (বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী) প্যালি প্রকারান্তরে তাই স্বীকার করছেন। যদিও সাক্ষ্যের (সৃষ্টি, পৃথিবী) সাথে প্রমাণের (স্রষ্টার অস্তিত্ব) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্যালি লঙ্ঘন করেছেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিয়ম - অনুমানের ভিত্তিতে কোন প্রমাণ গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা, যতক্ষন না পর্যন্ত সেই অনুমানকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে। প্যালির প্রাথমিক অনুমান (hypothesis) হচ্ছে, এই পৃথিবী 'ডিজাইন' করা হয়েছে। এই অনুমান যে ভ্রান্ত নয়, প্যালি তা প্রমাণের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি। সঙ্গত কারনেই, এখন পর্যন্ত কারো পক্ষেই এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

ইদানীংকালেও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা এই ধরণের যুক্তিই দেন। এরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মান্ড এতই জটিল যে, কোন উচ্চতর শক্তির ডিজাইন ছাড়া এর অস্তিত্ব অসম্ভব। তারা বলেন যে, জটিলতাইতো প্রমাণ করে উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী বুদ্ধিমান কোন ডিজাইনার এটা বানিয়েছেন। সাধারন চিন্তায় এই যুক্তির অসারতা চট্ করে ধরা পড়ে না। এর সুযোগেই এরা ইন্টেলিজেণ্ট ডিজাইনকে বিবর্তনতত্ত্বের পাশাপাশি বিকল্প তত্ত্ব হিসেবে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে) স্কুল-কলেজে পড়ানোর দাবী জানাচ্ছে। 'ইন্টেলিজেন্স', 'ডিজাইন', এবং 'জটিলতা' শব্দগুলির ভুল ব্যাখা এবং প্রয়োগের

ওপরেই এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। কোন সাদা জিনিষ দেখে যদি কেউ বলে, "জিনিষটা এতই সাদা, এটা দুধ না হয়েই যায় না," আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না এই বাক্যের বক্তার সাদা জিনিষ এবং দুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সীমিত। যারা মনে করেন, "জটিলতা মানেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" তারাও জটিলতা এবং ডিজাইন সম্পর্কে তাদের সীমিত জ্ঞানেরই পরিচয় দেন।

রিচার্ড ডকিন্স [৩] তাঁর *The Blind Watchmaker*–এ প্যালির ধারনা সম্পর্কে লেখেন,

> "প্রকৃতিতে (বা Nature-এ) সব কিছুই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে চলে। যদি ঘড়ির কারিগর কাউকে বলতেই হয়, তবে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাধীন অন্ধ সূত্রগুলি। সত্যিকারের ঘড়ি-নির্মাতার থাকতে হয় সম্মুখদৃষ্টি; ঘড়ির বিভিন্ন পার্টস, কল-কব্জা এবং তাদের মধ্যকার সংযোগক্রিয়া ঘড়ি-নির্মাতার ডিজাইন এবং পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। ঘড়ি-নির্মাতা তার মনশ্চক্ষুতে দেখতে পান এই ঘড়ির ভবিষ্যত কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য । ডারউইন আবিষ্কৃত 'ন্যাচারাল সিলেকশন' বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া অন্ধ এবং অচেতন। এই প্রক্রিয়া নিজে নিজেই চলে। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য আছে মনে হলেও জীবনের অস্তিত্ব ব্যাখ্যাকারী প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার কোন উদ্দেশ্য নাই। এই প্রক্রিয়ার কোন মন নাই, মনশ্চক্ষু নাই। ভবিষ্যতের জন্য এর কোন পরিকল্পনা নাই, কোন অন্তর্দৃষ্টি নাই, নাই কোন সম্মুখদৃষ্টিও। আসলে এর কোন দৃষ্টিই নাই। প্রকৃতিতে 'ন্যাচারাল সিলেকশন'-এর ভুমিকা যদি ঘড়ি নির্মাতার মতোই হবে, তবে বলতে হয়, এ হচ্ছে এক অন্ধ ঘড়িনির্মাতা।"

মানুষের চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতা

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জটিল ও 'পারফেক্ট' ডিজাইন

ডিজাইন যত জটিল হয়, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কলাকৌশল যতই সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার আওতার বাইরে হয়, এই শ্রদ্ধা আর প্রশংসার মাত্রা ততই বেশী হয়। আর তাই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীদের মতে, সবচেয়ে জটিলতম ঘড়ি, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড যিনি বানিয়েছেন সব প্রশংসাতো তারই প্রাপ্য হওয়া উচিৎ। বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতো বা প্রাণের মতো 'জটিল' 'সিস্টেম' ডিজাইন ছাড়া বানানো হয়েছে এবং এই সিস্টেমগুলি কোন 'পরিকল্পনা' ছাড়া 'নিয়মমাফিক' চলছে এটা মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন। যুক্তিটা হচ্ছে এরকম - বিশ্বব্রহ্মান্ড নিশ্চয়ই বানানো হয়েছে, না বানালে আসলো কোত্থেকে? আর বানানো যখন হয়েছেই, কেউ না কেউ বানিয়েছেন, সেই কেউ না কেউই হচ্ছেন ভগবান। এই ধারণাই হচ্ছে তথাকথিত 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্বের ভিত্তিমূল।

‘জটিল’ ‘সিস্টেম’ ‘পরিকল্পনা’ ‘নিয়মমাফিক’ ‘ইন্টেলিজেন্ট’ ‘ডিজাইন’ এই শব্দগুলি আমরা অর্থাৎ মানুষেরাই উদ্ভাবন করেছি। এগুলো স্বর্গ থেকে কোন আসমানী কিতাবের মাধ্যমে আসেনি। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যে জগৎ, তাকে আর সে জগতের মধ্যে যে কর্মকান্ড আমরা চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা এই শব্দগুলি উদ্ভাবন করেছি। অথচ আমরা আবার এই শব্দগুলিকেই ব্যবহার করছি যে জগৎ আমাদের কাছে এখনো অজানা, রহস্যময় তাকে ব্যাখ্যা করতে। ঘড়িকে তুলনা হিসেবে ব্যবহার করছি, যা আসলে ঘড়ির মতোই নয় তার সাথে। আর নিজেদের আবিষ্কৃত তুলনার অভিনবত্বে নিজেরাই হচ্ছি মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভুত। নিজেরাই নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার স্রষ্টা সৃষ্টি করেছি।

ডকিন্স ফ্যালাসিটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে, “পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাধীন এই পৃথিবীতে বিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়া, এমন কি প্রাণের অস্তিত্বও, সত্যিই বিস্ময়কর – অথবা বলা উচিত আপাতঃ বিস্ময়কর; কারণ, বিস্ময় হচ্ছে এক ধরনের আবেগের বহিপ্রকাশ যা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত, যে মস্তিষ্ক আবার সেই খোদ বিস্ময়কর প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি”।[৪]

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘সীমার মাঝে অসীমের’ সুর শুনছি, আবার নিজের মধ্যে সেই অসীমের ‘মধুর প্রকাশের’ আধ্যাত্মিক চেতনায় হচ্ছি উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন কবি ছিলেন, তাঁর কবিতার এই ছত্রটিতে তিনি শুধু যে এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অদ্ভুত সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাই নয়; আমাদের অর্থাৎ, মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতাকেও (বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর নিজের কাব্যভাবনা প্রকাশের সীমাবদ্ধতাকে নয়) ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অননুকরণীয় রচনাশৈলী দিয়ে। আইনস্টাইনও এই ধরনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলেছেন। বলেছেন যে, যে কোন চিন্তাশীল মানুষ 'সৃষ্টি'র বিরাটত্বে অভিভূত এবং মুগ্ধ হতে বাধ্য। তিনি একে এক ধরনের ‘রিলিজিয়াস’ অনুভূতির সাথে তুলনা করেছেন। ডকিন্স এই প্রসঙ্গে বলছেন, আইনস্টাইন ‘রিলিজিয়াস’ বলতে ধার্মিকতা বোঝান নি, খুব সম্ভবত আধ্যাত্মিকতা বুঝিয়েছেন। ডকিন্সের মতে আইনস্টাইন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না।[৫]

কিন্তু জটিলতার অন্য ব্যখ্যাও আছে। বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব (Chaos Theory) অনুসারে, জটিলতা বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ভুত হতে পারে; জটিলতার পিছনে কোন পরিকল্পনা নাও থাকতে পারে। আসলে, পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতেই জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নয় কি? কোন প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রন না থাকলেই প্রক্রিয়াটা জটিল হয়ে পড়তে দেখা যায়। মনে রাখা দরকার, জটিল কথাটা এসেছে জট থেকে, জট পাকাতে কি ডিজাইন লাগে? বিশৃংখল এবং পরিকল্পনাহীন বিবর্তনই এই বিশ্বে জটিলতার কারণ; এই মতের পেছনে যুক্তি আছে।

বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ ইলিয়া প্রিগোজিন, ইসাবেল স্টেঙ্গারস-এর সাথে লেখা তাঁর বই *Order Out of Chaos, Man’s New Dialogue with Nature* – এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[৬] মোদ্দা কথা হলো, বিশ্বে; বেশির ভাগ সিস্টেমই উন্মুক্ত, আবদ্ধ নয়, (open systems, as opposed to closed systems); আর উন্মুক্ত

সিস্টেমগুলি তাদের পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত শক্তি, পদার্থ অথবা তথ্য আদান-প্রদান করছে। নিসন্দেহে, জৈবিক এবং সামাজিক সিস্টেমগুলি উন্মুক্ত, এবং তাই এগুলোকে যান্ত্রিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। উইলিয়াম প্যালি ঠিক এই ভুলটাই করেছিলেন, বিশ্বব্রহ্মান্ডকে ঘড়ির সাথে তুলনা করতে গিয়ে।

আবার এটাও মনে রাখার দরকার যে জটিল মানেই 'পারফেক্ট' নয়। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবী করেন যে, সৃষ্টি শুধু জটিলই নয়, 'পারফেক্ট'ও। অথচ, 'পারফেক্ট' বলতে আমরা কি বুঝি এ নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। সেদিন ইন্টারনেটে দেখলাম একজন প্রশ্ন রেখেছেন, খোদাতালা যদি আমাদের পারফেক্ট করেই সৃষ্টি করে থাকবেন, তবে আমরা খৎনা (প্রচলিত কথায় মুসলমানি) করাই কেন? প্রশ্নটা হাল্কা হতে পারে, তবে উড়িয়ে দেবার মতো কি?

ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনের আর একটা উদাহরণ - আল্লাহতালা আমাদের এমন নিঁখুত এবং সুবিন্যস্ত পৃথিবী উপহার দিয়েছেন যে, 'লিপ ইয়ার' দিয়ে 'ঠিক' করার পরেও প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালন্ডারে 'ভুলের' পরিমান প্রতিদিন প্রায় সাতাশ সেকেন্ডের মতো, অর্থাৎ প্রতি তিন হাজার দুইশত ছত্রিশ বছরে প্রায় একদিন করে। খারাপ ডিজাইনের আরো সব চিত্তাকর্ষক উদাহরণ আছে অভিজিৎ রায়ের চমৎকার লেখা "ব্যাড ডিজাইন"-এ।[৭]

বিবর্তনতত্ত্ব বোঝার সমস্যা

বিবর্তন তত্ত্ব সহজে মেনে নেয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই মুশকিল। রিচার্ড ডকিন্সের মতে এর কারণ হচ্ছে,

> "মনে হয়, মানুষের মস্তিষ্ক যেন ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বকে ভুল বোঝার জন্য - যেন এই তত্ত্বটাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। সৃষ্টিশীল ডিজাইনার হিসেবে আমাদের অর্থাৎ মানুষের বিরাট সাফল্যই আমাদের মস্তিষ্কে মনে হয় ডারউইনতত্ত্বের সহজাত বিরোধিতার জন্ম দিয়েছে। প্রকৌশল আর শিল্পকলার চমৎকার সব সৃষ্টি আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি আমাদের চারপাশে। জটিল, বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত সুন্দর এই সৃষ্টিগুলি পূর্বপরিকল্পিত মেধাবী চিন্তার অবধারিত ফলশ্রুতি। ডিজাইন ছাড়া জটিল কোন জিনিষের সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, এমন ধারণাতে আমরা অভ্যস্ত নই। স্বাভাবিক এবং সহজাত বুদ্ধি-বিবেচনার বিপরীতে নিজেদের চিন্তার জগতে এক বিরাট উত্তরণ ঘটাতে না পারলে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) আর ওয়ালেসের(১৮২৩-১৯১৩) [৮] পক্ষে কিছুতেই বলা সম্ভব হতো না যে, প্রাণের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝার বিকল্প এক পথ আছে; এবং একবার ভালোভাবে বুঝতে পারলে এই পথটাকেই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হতে বাধ্য। চিন্তার এই উত্তরণ এতই ব্যাপক যে, অনেকেই এখন পর্যন্ত তা ঘটাতে পারেননি নিজেদের মনে"।[৯]

সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির ফলেই মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার অবয়ব তৈরী হয়েছে একজন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারের ইমেজে। ফ্যালাসিটা হচ্ছে মানুষের চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতাই এই ধরণের চিন্তার বা কল্পনার উৎস। বিশ্বব্রহ্মান্ড বা প্রাণ আমাদের অনেকের কাছে এক বিস্ময়কর মেশিন বা ইঞ্জিন বিশেষ। এজন্যই কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে আমরা মানুষের আদলে চিন্তা করি, মানুষের গুনাবলীর চূড়ান্ত রূপগুলি তাঁর উপর আরোপ করি। শুধু কি গুনাবলীই, আমরা মানুষের দোষ-ত্রুটির চরম প্রকাশও এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার চরিত্রে দেখতে চাই। বলেও থাকি, মানুষের জন্য যা পাপ দেবতাদের বেলায় তাই লীলাখেলা। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের মতোই ক্ষমতালোভী রিপুতাড়িত একজন প্রভূ হিসেবে কল্পনা করি। তার মধ্যে দেখতে পাই মানবীয় গুনাবলীর চরমতম বিকাশ, আর দানবীয় রিপুপরায়নতার চূড়ান্ত প্রকাশ। এই প্রভূ পরম করুনাময়, কিন্তু আবার নিয়ন্ত্রন করতে পছন্দ করেন; দারুন নিরাসক্ত, জাগতিক সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে, কিন্তু আবার স্তুতি-প্রশংসা পেলে ভীষন খুশী হন; মহাপরাক্রমশালী অত্যাচারী রাজা-মহারাজাদের মতো আনুগত্য দাবী করেন এবং না পেলে কঠোর শাস্তি দেন। এই প্রভু মানুষের মতোই তোষামদে তুষ্ট হন, অবাধ্যতায় হন রুষ্ট।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে এমনি সব পরস্পর-বিরোধী ধারণায়, কুসংস্কারে এবং আজগুবি কল্প-কাহিনীতে বিশ্বাসী ছিল। এখনো অনেকেই আছেন সেরকম। মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতার জন্যই একসময়ে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য বৃত্তাকারে ঘুরছে ভাবা হতো। এবং বলা হতো এটাই ধর্মের কথা। কিন্তু বিজ্ঞান যখন বললো যে, না ব্যাপারটা আসলে উল্টো, পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। শুরু হয়ে গেল সংঘাত। পৃথিবী, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে বিজ্ঞান যখনই নতুন কোন ধারণার কথা বলেছে, যখনই নতুন কোন ব্যাখ্যা দিয়েছে, ধর্মবাদীরা তখনই তেড়ে-মেরে ছুটে এসেছে। অথচ বিজ্ঞানের কাজ সত্যের অনুসন্ধান আর তাই বিজ্ঞানের চালিকা শক্তি হচ্ছে অনুসন্ধিৎসা। ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করা বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মিথ্যা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই, বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কারে ধর্ম নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ধর্মান্ধদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ঘোরতর প্রতিক্রিয়ার।

অনিবার্য সংঘাত

বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে ধর্মশাসিত সমাজের মধ্য থেকে। বিজ্ঞান মাথা তুলে দাঁড়ায় ধর্মের কোলেই। নিকোলাই কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) [১০] ছিলেন একজন ক্যথলিক ধর্মযাজক। তার লেখা *On the Revolutions of the Heavenly Bodies*-এ প্রথম (১৫৪৩) শোনা যায় সূর্যই বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রে এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে। (যদিও সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার কথা শোনা গিয়েছিল আরো আগে, গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস, এরিস্টারখাস প্রমুখের ধারণায়।) চার্চের সমর্থনপুষ্ট টলেমীয় পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাকে এই প্রথম বিজ্ঞান সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করে তুললো। কোপার্নিকাসের ধারণাও পুরোপুরি সঠিক ছিল না, তিনি ভেবেছিলেন এই ঘূর্ণনের গতিপথ বৃত্তাকার। মজার ব্যাপার হচ্ছে কোপার্নিকাস তার গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন পোপকে। সেটা করেও বোধ হয় ছাড় পেতেন

না তিনি। পৃথিবীকে এবং তার ভেতরে বসবাসকারী সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রদায়কে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করার মহা অপরাধে তাকে হয়তো শাস্তি পেতেই হতো। যদি না বইটি যে বছর প্রকাশিত হয় সে বছরেই তিনি মারা যেতেন। কথিত আছে, যেদিন বইটা তাঁর হাতে আসে সেদিনই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সে যুগে রাষ্ট্রের বদলে চার্চ ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার উৎসস্থল। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চের মধ্যেই চলতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কিংবা চিন্তাভাবনা। কোপার্নিকাসের মত একজন ধর্মযাজকের অবসরে বিজ্ঞানচর্চা তাই সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মোটেও অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।

মানুষের ইতিহাসে ধর্মের এবং ধর্মভিত্তিক আচার-আচরন ও চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব হয়েছে অনেক আগে, কমপক্ষে কয়েক হাজার বছর আগে। তুলনামুলক হিসাবে বিজ্ঞান মাত্র সেদিনকার ঘটনা, বিজ্ঞানের বয়স বড়জোর চার থেকে পাঁচশ বছর। বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে সব প্রশ্নের উত্তর, সব সমস্যার সমাধান ধর্মেই খোঁজা হতো। আগেকার দিনে ধর্মই ছিল বিজ্ঞানের বিকল্প। শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সব কিছুর বিধি-বিধান আইন-কানুনের উৎস ছিল ধর্ম। এখনও, এই যুগেও ধর্মাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ মানুষেরা মনে করেন তাই হওয়া উচিত। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রম-অগ্রগতি সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ধর্মানুসারীদের। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হয়েছে, ধর্ম ততই প্রতিক্রিয়াশীল ভুমিকা নিয়েছে। এই ভুমিকা এক এক যুগে এক এক রকমের, আগে ছিল মারমুখী সংঘাতের এখন অনেকটা সমন্বয়ের, সহাবস্থানের। বিজ্ঞানের সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করে আর যে পার পাওয়া যাচ্ছে না এবং যাবেও না, ধর্মের প্রবক্তারা তা মোটামুটি বুঝে নিয়েছেন। তাই সরাসরি সংঘাতের কথা আর নয়, বরং আজকাল তাদের মুখেই সমন্বয়ের কথা শোনা যায়। লক্ষ্যণীয় যে, সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক যারা, তাদের এই ধর্ম আর বিজ্ঞানের সমন্বয় নিয়ে মাথাব্যথা নাই। আগ্রহটা সবসময়ই দেখা যায় আসছে ধর্মওয়ালাদের দিক থেকে।

সংঘাত, সহাবস্থান, সমন্বয়–ধর্মভিত্তিক চিন্তাধারার ক্রমপশ্চাদপসরন

> *মানুষ ঈশ্বর শব্দটাকে অত সহজে বাদ দিতে পারে না, যত সহজে ঈশ্বরের ধারণাটাকে বাতিল করে দিতে পারে।* – বার্ট্রান্ড রাসেল। [১১]

সমন্বয় কেন?

বার্ট্রান্ড রাসেলের (১৮৭২-১৯৭০) 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের' (*Religion and Science*) যে সংস্করনটা আমার হাতে আছে, তাতে উপক্রমণিকা (introduction) লিখেছেন বিজ্ঞান-দর্শনের প্রখ্যাত এবং বিতর্কিত পন্ডিত গবেষক মাইকেল রিউস।[১২] এই উপক্রমণিকায় মাইকেল রিউস লিখেছেন, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত-সমন্বয়ের চারটি রূপ দেখা যায়।

এক – যুদ্ধংদেহী, বিরোধমুলক। যখন ধর্মবাদীরা মনে করেন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার মিথ্যা। ধর্মান্ধদের এই দলে ফেলা যায়। এরা ছয় হাজার বছর আগে ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বাস করেন, আদম-হাওয়ার গল্প, নুহের প্লাবন এসব গল্পকাহিনী সত্যি বলে মানেন। এরা বিশ্বাস করতে পারেন না যে আর্মস্ট্রংরা চাঁদে গিয়েছিলেন। আমেরিকায় এরাই হচ্ছেন 'ক্রিয়েশন' তত্ত্বের অনুসারী।

দুই – পার্থক্যতায় বিশ্বাসী, সহাবস্থানমুলক। এরা মনে করেন যে, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতের কোন কারণ নাই। কারণ দুটো সম্পূর্ন আলাদা জিনিষ। এদের কাজ-কারবার সম্পূর্ন ভিন্ন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। ধর্মে যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, বিজ্ঞানে তা পাওয়া যাবেনা, আর বিজ্ঞানের গবেষণায় ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা হবেনা। এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত, এমনকি বিজ্ঞানীরাও আছেন। এরা 'বিশ্বাসে মিলে হরি, তর্কে বহুদূর' এই নীতির প্রবক্তা এবং সহজে বিজ্ঞানমনস্কদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন না। এরা মনে করেন, বিজ্ঞানে পাওয়া যায় 'কিভাবে হয়' (how) প্রশ্নের উত্তর, আর ধর্মে 'কেন হয়' (why) প্রশ্নের। এরা আদম-হাওয়ার গল্প সত্যি কি মিথ্যা এই তর্কে যান না, কিন্তু এই গল্পের অন্তর্নিহিত শিক্ষায়, আমাদের কি করা উচিৎ এবং কেন করা উচিৎ তাতে বিশ্বাস করেন। এরা মনে করেন আমাদের স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকা উচিৎ এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বশীল থাকা উচিৎ। এদের অনেকেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

তিন – সংলাপে বিশ্বাসী, সমন্বয়মূলক। এরা মনে করেন ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হলেও দু'এর মধ্যে সংযোগ আছে এবং কিছু কিছু ব্যাপার ধর্ম আর বিজ্ঞান দুটোরই আওতায় পড়ে। তাই এ দু'এর মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক। এরা ধর্মকে যুক্তির সাহায্যে গ্রহনযোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এদের অনেকেই বাইবেলীয় আজগুবি গল্পগুলির সবকটিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে মনে করেন না; নিরন্তর চেষ্টা করেন এই গল্পগুলির পেছনের রূপকার্থ আবিষ্কার করতে এবং তা অবিশ্বাসীদের বোঝাতে। এরা একদিকে বিবর্তনতত্ত্ব স্বীকার করে নেন, অন্যদিকে একজোড়া আদি মানব-মানবীর ধারণায়ও বিশ্বাস করেন। স্বভাবতই স্ববিরোধী, চেপে ধরলে এরা দ্বিতীয় গ্রুপের ধর্মাচ্ছন্নদের মতই বলে বসেন, বিজ্ঞান কি পেরেছে ঈশ্বর নাই তা প্রমাণ করতে? কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব যে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিজ্ঞানের ওপর বর্তায় না, এরা তা বোঝেন না। এদের বিশ্বাস বিজ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, ধর্মই পারে সেখানে পথ দেখাতে।

চার – সম্মিলনে বিশ্বাসী, অভিন্নতামূলক, সম্পৃক্ততাবাদী। এই ধারায় যারা চিন্তা করেন তারা মনে করেন, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে আসলে কোন দ্বন্দ নাই। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণে ধর্মীয় মতবাদের সঠিকতাই প্রমাণিত হয়। এদের ধারনা ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য কৃত্রিম। এরাও বিবর্তনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পুরোপুরিই মানেন, কিন্তু এটাও মনে করেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিনত করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে এরা ব্যর্থ হন।

বলা দরকার, মাইকেল রিউস একজন সমন্বয়পন্থী, যদিও নিজেকে নাস্তিক বলে দাবী করেন। বিবর্তনতত্ত্ব পুরোপুরি মেনে নিয়েও খৃষ্টান হিসেবে জীবন যাপন করা যায় বলে তিনি মনে করেন। [১৩] তাই তিনি কোথায়ও বলেন নি, যারা কোন না কোন ভাবে ধর্মাচ্ছন্ন শুধুমাত্র তারাই এই উপরোক্ত চার গ্রুপের কোন একটিতে পড়েন। তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলকে সংঘাতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, মাইকেল রিউসরা সব বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকেই সংঘাতপন্থী মনে করেন। আসল ব্যাপারটা হলো এই যে, সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক কোন ব্যক্তিই সমন্বয়পন্থী কিংবা সহাবস্থানপন্থী হতে পারেন না। এবং সে কারণে তারা সংঘাতপন্থীও নন। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় ধর্ম বা ধর্মীয় মতবাদ প্রাসঙ্গিক কিংবা প্রয়োজনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে ফরাসী গণিতজ্ঞ ও জোতির্বিদ পিয়ের-সাইমন ল্যাপলাসের (১৭৪৯-১৮২৭) কথা প্রণিধানযোগ্য। জোতির্বিদ্যার ওপরে ল্যাপলাসের লেখা বইটা দেখে নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন, "আপনার লেখা বইটা খুবই ভালো, কিন্তু ঈশ্বরের কোন উল্লেখ দেখছিনা কেন?' ল্যাপলাস নির্বিকারে উত্তর দিয়েছিলেন, "স্যার, আমার ওই অনুমানটার (hypothesis) কোন প্রয়োজন ছিল না"।

(মাইকেল রিউসের মতে, ডারউইন নাকি প্যালি-বর্নিত ডিজাইন খুঁজতে গিয়ে বিবর্তনতত্ত্ব আবিষ্কার করে বসেন। মাইকেল রিউস আরো মনে করেন যে, ডিজাইনতত্ত্ব ছাড়া নাকি বিবর্তনতত্তের আবিষ্কার সম্ভব হতো না। বিবর্তনবাদীদের এইজন্য নাকি প্যালির ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। অদ্ভুত যুক্তি বটে! রাজতন্ত্রের হাত থেকে ভারতের মুক্তির জন্য এবং ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীকে যেন বলা হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে!)

ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত-সমন্বয়ের এই চার অবস্থানের বর্ণনা দেয়ার পর খুবই চতুরতার সাথে রিউস এই উপক্রমণিকাতেই লিখেছেন যে, তিনি বলছেন না এই চারটির মধ্যে কোনটি সঠিক এবং কোনগুলি বেঠিক। তিনি রাসেলের বইয়ের পাঠকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এই বলে যে এই সিদ্ধান্ত "আপনাদের পাঠকদের"। আবার এও বলছেন যে, রাসেলের এই বইটিতে বিজ্ঞানমনস্করা (তাঁর মতে, বিজ্ঞানবাদী সংঘাতপন্থীরা) পাবেন তাদের অবস্থানের পক্ষে খুবই পরিষ্কার এবং জোরালো যুক্তি। রিউস সমন্বয়পন্থীদেরও (মানে, ধর্মাচ্ছন্নদেরও) বলছেন এই বইটি পড়তে, বিপক্ষের যুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য, "নিজের অবস্থানের বিপক্ষে সবচেয়ে ধারালো যুক্তি যদি শুনতে চান, পড়ুন এই বইটি, বিজ্ঞানের পক্ষে এবং ধর্মের বিরুদ্ধে এমন যুক্তিপূর্ন আলোচনা আর কোথায়ও পাবেন না; তবে সাবধান, আপনার মত পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে"। রাসেলের 'রিলিজিয়ন এন্ড সায়েন্স'-এর যে কোন পাঠকই মানবেন, রিউসের আশংকা অমুলক নয়।

রিউসের ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, এটা ঠিক যে, পৃথিবীতে ধর্মাচ্ছন্ন মানুষের সংখ্যাই বেশী এবং তারা রিউস-বর্ণিত চার গ্রুপের কোন একটিতে পড়েন।

প্রথম দলের (ধর্মাচ্ছন্ন সংঘাতবাদী) প্রভাব প্রধানত অশিক্ষিত মানুষের ওপর। কিন্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলে অনেক শিক্ষিত লোকজন আছেন। আমরা এঁদেরকেই দেখি প্রতিদিন আমাদের চারপাশে। বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য এরা এই যুগে আর ধর্মের দ্বারস্থ হন না। কিন্তু নৈতিকতা আর মূল্যবোধের শিক্ষার জন্য ধর্মের ওপর নির্ভর করেন।

ধর্মের পিছু হটা

বিজ্ঞানের উন্মেষকালে ধর্মের পরাক্রম ছিল প্রবল। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব তাই ছিল বিপ্লবাত্মক। ধর্মবাদীদের মধ্যে শুরু হলো ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার। বলা হলো, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে এত জটিল করে বানাননি; বিশ্বব্রহ্মান্ডের সবকিছুই নিখুঁত এবং সুবিন্যস্ত; ঈশ্বর পৃথিবীকে এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়েছেন কারণ পৃথিবী হচ্ছে মানুষের বাসভূমি; সৃষ্টিকর্তা সবকিছু মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। (ধর্মবাদীদের স্ববিরোধিতা এখানে লক্ষ্যনীয়; এরা আগে জটিলতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, পরে জটিলতাকেই 'ডিজাইনের প্রমাণ' বলে দাবী করেছেন।)

পোপকে উৎসর্গ করার পরেও কোপার্নিকাসের বইয়ের প্রকাশক ওসিয়ান্দরের স্বস্তি ছিলনা। তিনি (সম্ভবত কোপার্নিকাসের অমতে) বইয়ের ভুমিকায় লিখে দেন, এই গ্রন্থে বর্ণিত পৃথিবীর গতি-তত্ত্বটি একটি অনুমান বিশেষ, একে প্রমাণিত সত্য হিসেবে দাবী করা হচ্ছেনা। [১৪] কোপার্নিকাস ও তার প্রকাশককে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসনের (স্যাঙ্কশন) ভয়ে। পরে রেনি ডেকার্টে (১৫৯৬-১৬৫০) কোপার্নিকাসের তত্তের প্রতি মৃদু সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাও ভয়ে ভয়ে। জিওদার্নো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) ক্যাথলিক চার্চের আদেশে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬০০ সালে। গ্যালিলিও গ্যালিলিকে (১৫৬৪-১৬৪২) শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল আমরণ।

কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। থেমে যাননি নিউটন, ডারউইন, এবং আইনস্টাইন। তাঁরা এবং তাঁদের সহযাত্রীরা বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য অনুসন্ধানের একমাত্র পন্থা হিসেবে। ধর্ম ক্রমাগত হয়েছে কোণঠাসা, ধর্মবাদীদের ক্রমশ পিছাতে হয়েছে, সংশোধন (এডজাস্ট) করতে হয়েছে নিজেদের অবস্থান। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মের দাপটে বিজ্ঞানের অবস্থান ছিল আত্মরক্ষামুলক, আর আজ ধর্মবাদীরাই বিচলিত, বিজ্ঞান ধর্মের পরিসীমায় নাক গলাচ্ছে বলে চিন্তিত। আগে বলা হতো, ধর্মের কোন আওতা বা বলয় নাই, ধর্ম সর্বব্যাপী। আর আজ সমন্বয়বাদীদের মুখে শোনা যায় 'স্বতন্ত্র বলয়ে'র কথা।

স্টিফেন জে গুল্ডের "স্বতন্ত্র বলয়" বা Nonoverlapping Magisteria তত্ত্ব [১৫] যা NOMA নামে খ্যাতি পেয়েছে, তার মূল কথা হচ্ছে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ধর্ম দিতে পারে না, তাই ধর্মের উচিৎ বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থাকা; একই যুক্তিতে বিজ্ঞানেরও উচিৎ নয়, ধর্মের বলয়ে নাক গলানো। দুই বিবদমান পক্ষকে সংঘাত থেকে বিরত রাখার যেন এক প্রাণান্তকর চেষ্টা! গুল্ডের মতে এটাই হচ্ছে সম্মানজনক পন্থা; তাঁর ভাষায় শুধু কূটনৈতিক নয়, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায়ও।

রিচার্ড ডকিন্স স্বতন্ত্র বলয় তত্ত্বের (Nonoverlapping Magisteria) বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন।[১৬] ডকিন্স সব ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের আওতার বাইরে রাখার চেষ্টাকে অসৎ মনোবৃত্তির পরিচায়ক মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়, ধর্মে যে সমস্ত অলৌকিক গল্প-কাহিনী দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হয়, সেই গল্পগুলির মধ্যে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানের উপকরণ; আর বিজ্ঞান যখন এই সব গাঁজাখুরি গল্প-কাহিনীর সত্যতা এবং সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তখনই বলা হয়, বিজ্ঞান ধর্মে নাক গলাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র বলয়ের প্রবক্তাদের মনে হয় শান্তিকামী, কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে যে শান্তি, তা কাম্য হওয়া উচিৎ নয়। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার, অনেক নাস্তিক বিজ্ঞানীও শুধুমাত্র সমন্বয়ের খাতিরে ধর্মবাদীদের সাথে আপোষ করতে প্রস্তুত। স্টিফেন গুল্ড এবং মাইকেল রিউস হচ্ছেন এই দলের বিজ্ঞানী। Nonoverlapping Magisteria হচ্ছে তাঁদের এই ধরনের মানসিকতারই ফলশ্রুতি। এঁরা বিজ্ঞানী হলেও বিভ্রান্তির শিকার এবং বিপজ্জনক ভাবে ধর্মাচ্ছন্ন। তানবীরা তালুকদার ডকিন্সের প্রবন্ধটার বাংলা অনুবাদ করেছেন 'মুক্তমনা'য়। [১৭] উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা বিজ্ঞানকে কখনোই ধর্ম বানাতে চাননা, কিন্তু সমন্বয়পন্থী ধর্মাচ্ছন্নরা ধর্মকে সবসময়েই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ নিয়ে বিজ্ঞানমনস্করা খুব একটা বিচলিত নন, বরং ধর্মাচ্ছন্নদেরই এ নিয়ে বেশী হইচই করতে দেখা যায়। এই দু'এর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনও ধর্মের প্রবক্তারাই অনুভব করেন বেশী। ধর্মবাদীরাই ধর্মকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানমনস্করা নয়। রাসেলের ভাষায়, "বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা মানে না, গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কর্তৃত্বসম্পন্ন কেউ বলেছে বলেই কোন কিছু মেনে নিতে হবে – বরং ঠিক উল্টোটা, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যা জানা যায় শুধুমাত্র তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়। এই 'নতুন' পদ্ধতির অভুতপূর্ব সাফল্য – তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ – ধর্মবাদীদের বাধ্য করে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে"।[১৮]

সে যুগে ধর্ম বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা ছিল, আজকাল তা আর সেরকম ভাবে নাই। এখন ধর্মবাদীরা ভীত বিজ্ঞান ধর্মের বিকাশে না বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানকে তাই ধর্মের বলয় থেকে দূরে রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এটা নিসন্দেহে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার, আর ধর্মের ক্রমপশ্চাদপসরনের নিদর্শন। সংঘাত ধর্মবাদীরাই সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞান নয়। সমন্বয়ও ধর্মবাদীদেরই মস্তিষ্কপ্রসুত, বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই সমন্বয়ের।

ধর্ম যেখানে প্রতিনিয়তই অবস্থান পরিবর্তন করছে বিজ্ঞানকে জায়গা করে দিতে, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সেখানে অপ্রতিরোধ্য, অপ্রতিহত। বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে সত্যের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া, নিত্যই নতুন জ্ঞানের পেছনে ছোটা।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা

ধর্ম্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোকের ধর্ম্ম

- মোতাহার হোসেন চৌধুরী[১৯]

ধর্মের প্রভাব

ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা আর ধর্ম-নির্দেশিত পাপ-পূণ্যের ধারণার মধ্যে ধর্মাচ্ছন্নরা কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। বিবেক-বুদ্ধির চেয়ে ধর্মের অনুশাসনের ওপরেই এদের আস্থা বেশী। এদের অনেকেই মনে করেন, বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার সত্যি হলেও ধর্মের প্রয়োজন আছে। আছে কি? একটু পরে এই প্রশ্নটা নিয়ে আবার আলোচনায় আসবো। এখন শুধু বলে রাখি, ধর্ম শুধু বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবেই ব্যর্থ নয়, মানুষের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার অসারতা নিয়ে যত কথাই বলা হোকনা কেন, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে ধর্ম আছে আমাদের চারপাশে, এবং আছে ব্যাপকভাবেই। সমাজে ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। ধর্মাচ্ছন্ন মানুষের সংখ্যা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের চেয়ে ঢের বেশী। এদের অনেকের কাছেই ধর্মের এবং সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কথায় কথায় 'ইনশাল্লা,' 'গড উইলিং,' 'সবই হরির ইচ্ছা' শুনতে আমরা অভ্যস্ত। পৃথিবীর আপামর মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধান না হলেও নিত্য-নতুন মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-সিনাগগ-টেম্পল তৈরীর কমতি নাই। চ্যারিটির টাকাপয়সার সিংহভাগ ব্যয়িত হয় এসবের পেছনেই। স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে নয়, মসজিদ-মাদ্রাসা-দরগাতেই মানুষ দান-খয়রাত করতে পছন্দ করে বেশী। সাপ্তাহিক 'টাইম' ম্যাগাজিনের একটা প্রতিবেদনে জানা যায় আমেরিকায় পরলোকে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের সংখ্যা মোটেও কমেনি, যদিও অনেকেই জানেনা তারা আসলে কিসে বিশ্বাস করে।[২০]

এখনো শোনা যায় দায়িত্বশীল মানুষের মুখ থেকে, 'আল্লা আমাদের পরীক্ষা করছেন,' 'আল্লার মাল আল্লায় নিয়েছেন' ধরণের কথাবার্তা। মহাত্মা গান্ধীও এলাহাবাদ ভুমিকম্পের (১৯৩৪) পরে বলেছিলেন ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন। [২১]

ধর্মের নামে ১৯৪৭-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানির মধ্য দিয়ে ভারত বিভক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আবারও ১৯৭১-এ আরো কয়েক লক্ষ মানুষের জীবনদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মের নামেই আজো মধ্যপ্রাচ্যে (প্যালেস্টাইনে, ইরাকে) চলছে অন্যায় জবরদখল, সন্ত্রাসের তান্ডব, মানুষ হত্যার উৎসব। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় ভাবধারার উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত অশান্তি, হানাহানি, খুনোখুনির মূল কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে একে সঙ্গবদ্ধ পাগলামী (collective madness) ছাড়া আর কি বলা যায়?

আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বরদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়; ধর্মাচ্ছন্ন মানুষের ভীড়ে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান, কিন্তু তাদের সংখ্যা এখনও তেমন বেশী নয়।

বিজ্ঞানের আওতা

এখনো অনেক কিছুই রয়ে গেছে আমাদের অজানা, সৃষ্টি-রহস্যের অনেক কিছুই এখনো রয়ে গেছে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু যতটুকুই জেনেছি, তার সবই বিজ্ঞানের মাধ্যমে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের ফলে। রাসেল বলেছেন, "জ্ঞান যতটুকুই অর্জন করা যায়, অর্জন করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে; আর বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারে না, মানুষের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়"।[২২]

ধর্মবাদীদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, 'নৈতিকতা, মুল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান (এথিক্স) বিজ্ঞান দিতে পারেনা। তাই ধর্মের প্রয়োজন আছে'। যেন ধর্মই আমাদেরকে চুরি-চামারি, খুন-খারাবি, অত্যাচার-ব্যাভিচার এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ করা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা তো বলে অন্য কথা। যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু, সে দেশে দুর্নীতির ব্যপকতা; আর যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ মানুষ সৃষ্টকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সে দেশে ধর্মবিরোধী অবাধ যৌন-অনাচার, ধর্মীয় অনুশাসন যে খুব একটা কার্যকর নয় তাই প্রমাণ করে। আমেরিকায় ইদানীংকালে খোদ ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মধ্যে যৌন-অনাচারের প্রাদূর্ভাব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মের মতো বিজ্ঞানে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়াটাই বোকামি। আসলে বিজ্ঞানমনস্করা তা করেও না। কারণ, বিজ্ঞান ধর্মের মতো দুনিয়ার সব প্রশ্নের উদ্ভট, মনগড়া উত্তর দেয় না। ধর্মবাদীরাই বিজ্ঞানকে ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করিয়ে দিয়ে বলে, বিজ্ঞান মূল্যবোধ, নৈতিকতা, 'এথিক্স', ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনা। 'তাই বিজ্ঞানকে মেনে নিলেও ধর্মকে বাদ দেয়া যায় না; ধর্ম মানুষকে নীতিবোধ, মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়, বিজ্ঞান কি দিতে পারে?', ধর্মাচ্ছন্নরা বলবে। কিন্তু একথা না বুঝে যে বিজ্ঞানের কাজ মানুষকে নীতিবোধ, মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান দেয়া নয়, শুধু এবং শুধুমাত্র সত্যের অনুসন্ধান করা।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত। বিজ্ঞান সাক্ষ্য-প্রমান ছাড়া কোনকিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে পারেনা। বিজ্ঞান কোন আদর্শ, মতবাদ, কিংবা বিশ্বাসব্যবস্থা (belief-system বা creed) নয়। ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা, পাপ-পূণ্যের পার্থক্য বিজ্ঞানে পাওয়ার কথা নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি মানুষের ন্যায়-অন্যায়, নীতিবোধ, মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তা করার কোন দরকারই নাই? অবশ্যই আছে, তবে তা বিজ্ঞানের আওতায় আসেনা।

বিজ্ঞানের কাজ নয় মানুষকে বলা, "সদা সত্য কথা বলিবে"। কিন্তু সত্য বলাটা যে, মানুষের জন্য স্বাভাবিক, মিথ্যাটা যে সহজাত নয়, বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে তা প্রমাণিত হতে

পারে। অপরাধপ্রবনতা কোন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বংশানুক্রমে পাওয়া জন্মগত স্বভাব কি না, কিংবা সমকামিতা পরিবেশ-প্রতিবেশ উদ্ভুত আচরণজনিত কুঅভ্যাসের ফল কি না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার নিস্পত্তি হতে পারে। [২৩]

পক্ষে-বিপক্ষে বিজ্ঞানীরা (সত্যিকারের সত্যান্বেষী এবং ধান্দাবাজ, দুই ধরনেরই) এ নিয়ে তর্কে মেতে উঠতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান বলে না, বলতে পারেনা, "সমকামিতা বিজ্ঞানসম্মত আচরণ নয়, তাই অনুচিত" কিংবা "চুরি-ডাকাতি করাটা বিজ্ঞানের নীতিবিরুদ্ধ"।

ধর্মাচ্ছন্ন গোষ্ঠীগুলি বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণকে (ক্ষেত্রবিশেষে পর্যবেক্ষণের অপব্যাখ্যাকে) নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য সবসময়ই সচেষ্ট। যখনই বিজ্ঞানের রায় তাদের অবস্থানের পক্ষে যায়, তখন তারা বিজ্ঞানের সেই পর্যবেক্ষণের পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। যখন যায়না, তখন বলেন বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ, অপর্যাপ্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, সমকামীদের মধ্যে 'এইডস' রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা বেশি এই পরিসংখ্যানকে ব্যবহার করে ধর্মবাদীরা দাবী করে থাকে যে, ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে চললে ঈশ্বর এইভাবেই পাপীদের শাস্তি দেন। 'এইডস' রোগী ছাড়া অন্য পাপীরা কেন তাদের জীবদ্দশায় শাস্তি পাবে না এবং কেন মৃত্যুর পরে তাদের অনন্তকাল ধরে নরকের আগুনে পুড়তে হবে, এই প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর এই ধর্মবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। আবার যখন, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলাফলে প্রমাণিত হয় যে, প্রার্থনা কোন কাজেই আসে না, তখন এরা বলেন প্রার্থনা বিজ্ঞানের আওতাধীন বিষয় নয়, কিংবা বিজ্ঞান সবসময় নির্ভুল নয় ।[২৪] ফরিদ আহমেদের মুক্তমনায় প্রকাশিত "প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?" প্রবন্ধে প্রার্থনার অকার্যকারিতা সম্পর্কে একটা তথ্যনির্ভর আলোচনা আছে।[২৫]

বিজ্ঞান আদর্শের ভিত্তি হতে পারেনা। মুল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দরের তুলনা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। ধর্মের প্রবক্তারা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীরা, ধর্মকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন, বিকল্প হিসেবে দেখেন। যে সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের দেয়ার কথা, সে সবও দিয়ে দেয়ার প্রয়াস পান, এমনকি আজগুবি হলেও। আর যে সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানে পাওয়ার কথা নয়, যেমন মূল্যবোধ, আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়-সংক্রান্ত তা বিজ্ঞান দিতে পারেনা বলে অযথা বিজ্ঞানকে অকার্যকর বলে দাবী করে বসেন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, এ ধরণের তর্কে স্বার্থান্বেষীরা বিজ্ঞানকে, বলা উচিৎ কিছু অসৎ বিজ্ঞানীকে, নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন এবং করেছেনও। যেমন, একবার শুনেছিলাম, এক মিশরীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামার কম্পিউটারকে দিয়ে 'প্রমাণ' করিয়েছেন যে, কোরান কোন মানুষের দ্বারা লিখিত হতে পারে না। বলা বাহুল্য প্রোগ্রামটা তিনি নিজেই লিখেছিলেন। এতে করে কোরান যে আসমানি কিতাব তা প্রমাণিত হয় নি, বরং কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতে প্রচলিত 'গারবেজ ইন, গারবেজ আউট' কথাটার আরেকটা ভাল উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিল।

বিজ্ঞানের অর্জনকে ধর্মের পক্ষে কাজে লাগানোর এই ধরনের বালখিল্য উদাহরণ প্রচুর দেখা যায়, এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার তেমন কোন কারণ দেখি না। তবে এর চেয়েও

বিজ্ঞানের অনেক বেশি বিপজ্জনক ব্যবহার সম্ভব। বার্ট্রান্ড রাসেল বিজ্ঞানকে শুধু মারণাস্ত্র আর যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্যই দায়ী করেন নি, তিনি পৃথিবীতে সেই সময়ের (১৯৩৫) অর্থনৈতিক অবস্থার নৈরাজ্যের জন্যও বিজ্ঞানকে প্রকারান্তরে দায়ী মনে করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সময়ে রাশিয়ায় কম্যুনিজম আর জার্মানিতে নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ে রাসেল খুবই বিচলিত হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা পরোক্ষভাবে হলেও এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলে মনে করতেন। তাঁর লেখা "রিলিজিয়ন এন্ড সায়েন্স"-এ এই আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, এই যুগে বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ আর ধর্ম বা চার্চ থেকে আসবেনা, আসবে আধিপত্যবাদী সরকারগুলো থেকে। এবং এরা ধর্মকে নয়, বরং বিজ্ঞানকেই ব্যবহার করতে চাইবে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। সুযোগ বুঝে এরা নিজেদের সেক্যুলার বলেও দাবী করবে, এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। প্রথমেই বলি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা (intellectual freedom)। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার ওপরেই নির্ভর করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, আর এখানেই রাসেলের আশংকা।[২৬] এই আশংকা মোটেও অবাস্তব নয় এবং তখনকার (১৯৩৫) তুলনায় এই যুগে মনে হয় তা আরো বেশি, যদিও ভিন্ন মাত্রার এবং ভিন্ন চরিত্রের। প্রসঙ্গটা এই রচনার মূল বিষয়বস্তুর বাইরে বলে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই তবে রাসেলের মতো আমিও মত প্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি । বিশেষ করে, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের এ ব্যপারে সচেতন থাকা উচিৎ।

ধর্ম কি প্রয়োজনীয়?

প্রথমে দেখা যাক বার্ট্রান্ড রাসেল এ সম্পর্কে কি বলেছেন। ১৯৩৫ এ যখন রাসেলের বিখ্যাত "রিলিজিয়ন এন্ড সায়েন্স" প্রকাশিত হয় তখন সমাজে ধর্মের দাপট ছিল নিসন্দেহে আজকের তুলনায় অনেক বেশি। (১৯৫০এ রাসেলের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অন্যতম কারন এই বইটা।) যদিও ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব ইতোমধ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে জোরেশোরে নাড়া লাগিয়েছে।

রাসেলের মতে, ক্রিড (Creed, যাকে আমি বলছি 'বিশ্বাসব্যবস্থা') হচ্ছে ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যকার সংঘাতের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎস। অনেক ধর্মাচ্ছন্ন মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত নীতিবোধ আর মূল্যবোধ আহরণ করেন এই বিশ্বাসব্যবস্থা থেকে। আর এই জন্যই তারা ধর্মকে মনে করেন অপরিহার্য। ব্যাপারটা রাসেল সুন্দর করে বুঝিয়েছেন 'খুন করা কেন খারাপ কাজ' এই প্রশ্নের অবতারণা করে; নীচের অংশটা রাসেলের এই সম্পর্কিত লেখার ভাবানুবাদ।[২৭]

> ধরা যাক এক বেয়াড়া সংশয়বাদী এক পুরোহিতকে প্রশ্ন করে বসলো, "আচ্ছা বলতো, খুন করলে কি হবে? আমি কেন খুন করবো না?" বলা যেতে পারতো, "তাহলে তোমার ফাঁসি হবে"। কিন্তু ফাঁসি কেন হবে তার পেছনে তেমন জোরালো নৈতিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নাই, আর ফাঁসি যে হবেই (ধরা যাক, পুলিশের দূর্নীতিপরায়নতা বা অযোগ্যতার কারণে) তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই পুরোহিতের পক্ষে খুব সহজ উত্তর হবে, "ধর্মে নিষেধ, মানুষ হত্যা মহাপাপ,

> পরকালে শাস্তি অবধারিত"। তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া যায় এতে কাজ হতেও পারে এবং সেই বেয়াড়া মানুষটা খুন করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে পরকালে শাস্তির ভয়ে । কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ধর্ম মানলে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে তাও, এবং এই ধরনের আরও অনেক মিথ্যা ও আজগুবি কথা, মেনে নিতে হয়, আর না মানলে ওই বেয়াড়া মানুষটাকে খুন করা থেকে নিবৃত্ত রাখা যাবে না এই ধরনের একটা আশংকার সৃষ্টি হয়।

রাসেলের মতে ধর্ম যে আজো টিকে আছে তার একটা বড় কারণ এই ধরনের আশংকা। কিন্তু খুন করা যে অন্যায়, অনৈতিক কাজ, এই মূল্যবোধ কি ধর্মীয় শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল? হার্ভাডের অধ্যাপক মার্ক হউজারের (Marc Hauser) মতে নীতিবোধ বিশ্বজনীন বা 'ইউনিভার্সাল'। মানব সভ্যতায় ভাষার উদ্ভবের মতো নীতিবোধেরও উদ্ভব ঘটেছে। সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে (সংস্কৃতিভেদে তারতম্য থাকলেও সব ভাষার অন্তর্নিহিত কাঠামোর গভীরে) আছে বিশ্বজনীনতা, ঠিক তেমনি নীতিবোধের মধ্যেও একই ধরনের বিশ্বজনীনতা দেখা যায়। এর মধ্যে ধর্মের কোন প্রভাব আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, কোন বিশেষ ধর্মের তো নয়ই।[২৮] জীবজগতের বিবর্তনের মতো মানুষের মনোজগতেও বিবর্তনের প্রক্রিয়া কাজ করে। অপার্থিব জামান তাঁর "ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?" প্রবন্ধে এর ওপরে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[২৯] উপসংহারে বলেছেন, নৈতিক আচরণ হচ্ছে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তমান বৈশিষ্ট্য।

দেখা যাচ্ছে বিবেকবোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ, বিচারবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, এসবের উৎস ধর্ম নয়। ধর্মপরায়ন না হয়েও বিবেকবান মানুষ হওয়া যায়। নরকের ভয়ে পাপকার্য্য থেকে বিরত থাকার, আর স্বর্গের লোভে পূণ্যকাজ করার মধ্যে যে সত্যিকারের মূল্যবোধের এবং নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না, তা কি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তাহলে ধর্মের প্রয়োজন কোথায়?

কিন্তু ধর্মের অনুপস্থিতিতে, ডকিন্সের স্বভাবজাত ভাষায়, মানুষের মগজে ঈশ্বর-সাইজের যে গর্তটির (গ্যাপ) সৃষ্টি হবে তাকে ভরাট করা হবে কি দিয়ে? ডকিন্স এর উত্তর দিয়েছেন - বলেছেন বিজ্ঞান দিয়ে, প্রতিনিয়ত সত্যানুসন্ধান যার কাজ। ডকিন্সের আশা এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে নতুন এক পৃথিবী - মিথ্যা নয়, সত্যের ভিত্তিতে।[৩০]

আমি বলবো, শুধু বিজ্ঞান দিয়ে নয়, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের দিয়ে গড়ে উঠবে যে কালচার বা সংস্কৃতি তাই দিয়ে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, "চুড়ান্ত বিচারে সংস্কৃতি হচ্ছে রুচি। ওই রুচিতে ভালো-মন্দের বোধ আছে, আছে আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টির স্পৃহা। রুচিকে সূক্ষ্ম বলা হয়, কিন্তু রুচিতেই সংস্কৃতি ধরা পড়ে; অভিব্যক্ত হয় নিজস্বতা ও মৌলিকত্ব। এই রুচিটা সমষ্টিগত, ব্যক্তি যার অংশীদার"।[৩১]

যে সংস্কৃতির কথা এখানে বলা হচ্ছে তার ভিত্তি ধর্ম, জাতীয়তা, রাষ্ট্র বা অঞ্চল নয়, তার ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা। মোতাহার হোসেন চৌধুরী এই সংস্কৃতির কথাই ভেবেছেন ধর্মের বিকল্প হিসেবে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও এই বিশ্বজনীন

কালচারের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছেন তাঁর 'আইডেন্টিটি এন্ড ভায়োলেন্স (*Identity and Violence*) বইয়ে।[৩২] অমর্ত্য সেন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন, অনেকটা বার্ট্রান্ড রাসেলের 'বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা'র মতো করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, আর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা নতুন সত্য আবিস্কারের জন্য জরুরী। আর নতুন সত্য আবিস্কার করাইতো বিজ্ঞানের কাজ। রাসেলের কথা, "নতুন সত্য প্রায়শই অস্বস্তিকর, বিশেষত ক্ষমতাধরদের কাছে; কিন্তু নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতার কদর্য ইতিহাস সত্বেও, আমাদের বুদ্ধিসম্পন্ন, যদিও দূর্বিনীত, মানবপ্রজাতির এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন"।[৩৩]

শেষের কথা

ধর্ম বিজ্ঞান হিসাবে ব্যর্থ কারণ ধর্ম ভুল ধারণা, মিথ্যা গল্প-কাহিনী আর আজগুবি কল্পনার উপর নির্ভরশীল, সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবে পশ্চাদপদ কারণ ধর্ম মানুষকে রুচিশীল হওয়ার প্রেরণা যোগায়না; ধর্ম মুল্যবোধের উৎস হিসাবে অপ্রয়োজনীয়, কারণ মূল্যবোধ ধর্মের চোখে পুরস্কার-তিরস্কারের অর্থহীন এবং অনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার্য; এবং ধর্ম এমন কি আধ্যাত্মিকতার বিকাশেও নিতান্তই অপ্রতুল এবং নিম্নমানের।

ধর্মকে বাদ দিয়েই গড়ে তুলতে হবে জীবনমুখী সংস্কৃতি, যার মূলে থাকবে সুরুচি - সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত। সংস্কৃতিই হবে ব্যক্তিক এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ, মূল্যবোধ আর নীতিবোধের ধারক ও বাহক। সম্মিলিত সচেতনতা (collective consciousness)-র উৎস হবে কালচার, ধর্ম নয়। রুচিশীল সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিকতা হবে সত্যিকারের উপভোগের বিষয়, বিকৃত অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) চিন্তা-চেতনার উৎস না হয়ে। মানুষ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও প্রকাশ উপভোগ করবে, সংগীতের মূর্ছনায়, কবিতার কাব্যময়তায়, ধর্মের অন্ধ চোরাগলিতে নয় । সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি খুঁজবে সাহিত্যে, শিল্পকলায়। রুচির উৎকর্ষতা দেবে উন্নত সংস্কৃতি, আর উন্নত সংস্কৃতি গড়বে উন্নত সমাজ।

মিথ্যা আর আজগুবি গল্প-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে উন্নত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ যে গড়ে তোলা যায় না, তা তো আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। ধর্মভিত্তিক সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষকে অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। বরঞ্চ যুগে যুগে ধর্মকেই দেখা গেছে, অন্যায়-অনাচার, নিপীড়ন-নির্যাতনের কাজে খুবই কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে।

তাই, ধর্মাচ্ছন্ন অন্ধকারে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞানমনস্ক আলোকিত মানুষ চাই আরো, আরো অনেক। ধর্মের নামে সঙ্গবদ্ধ পাগলামী (collective madness) নয়, চাই কালচারের চর্চার ফলে ঋদ্ধ সম্মিলিত সচেতনতা (collective consciousness)।

ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে বিজ্ঞানমনস্ক ধারাটি ক্ষীণ হলেও উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। একদিন ধর্মাচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে এই বিরুদ্ধ ধারাটিই পরিণত হবে প্রবল স্রোতে, বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই বলে।

তথ্যনির্দেশ

(১) আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনাসমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

(২) উইলিয়াম প্যালির *Natural Theology – or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature* থেকে। Translation of:

". . . when we come to inspect the watch, we perceive. . . that its several parts are framed and put together for a purpose, e.g. that they are so formed and adjusted as to produce motion, and that motion so regulated as to point out the hour of the day; that if the different parts had been differently shaped from what they are, or placed after any other manner or in any other order than that in which they are placed, either no motion at all would have been carried on in the machine, or none which would have answered the use that is now served by it. . . . the inference we think is inevitable, that the watch must have had a maker -- that there must have existed, at some time and at some place or other, an artificer or artificers who formed it for the purpose which we find it actually to answer, who comprehended its construction and designed its use."

Available: **http://www.ucmp.berkeley.edu/history/paley.html**

(৩) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins)*The Blind Watchmaker*, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1987, p. 5. Translation of:

"All appearances to the contrary, the only watchmaker in nature is the blind forces of physics, albeit deployed in a very special way. A true watchmaker has foresight: he designs his cogs and springs, and plans their interconnections, with a future purpose in this mind's eye. Natural selection, the blind, unconscious, automatic process which Darwin discovered, and which we now know is the explanation for the existence and apparently purposeful form of all life, has no purpose in mind. It has no mind and no mind's eye. It does not plan for the future. It has no vision, no foresight, no sight at all. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the *blind* watchmaker."

(৪) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 366. Translation of:

"The evolution of complex life, indeed its very existence in a universe obeying physical laws, is wonderfully surprising – or would be but for the fact that surprise is an emotion that can exist only in a brain which is the product of that very surprising process."

(৫) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 15. Einstein as quoted:

"I am a deeply religious nonbeliever. This is a somewhat new kind of religion. I have never imputed to Nature a purpose or a goal, or anything that could be understood as anthropomorphic. What I see in Nature is a magnificent structure that we can

comprehend only very imperfectly, and that must fill a thinking person with a feeling of humility. This is a genuinely religious feeling that has nothing to do with mysticism. The idea of a personal God is quite alien to me and seems even naïve."

(৬) ইলিয়া প্রিগোজিন ও ইসাবেল স্টেঙ্গারস, (Ilya Prigogine and Isabelle Stengers) *Order Out of Chaos, Man's New Dialogue with Nature,* Bantam Books, New York, 1984. Brief paraphrase of:

"While some parts of the universe may operate like machines, these are closed systems, and closed systems, at best, form only a small part of the physical universe. Most phenomena of interest to us are, in fact, *open systems, exchanging energy or matter* (and one might add, information) with their environment. Surely biological and social systems are open, which means that the attempt to understand them in mechanistic terms is doomed to failure." Available: **http://www.talkorigins.org/faqs/faq-meritt/complexity.html#chaos**

(৭) অভিজিৎ রায়, *"ব্যাড ডিজাইন"*, মুক্তমনা। Available: **http://www.mukto-Mona.com/Special_Event_/Darwin_day/2007/avi_bad_design.pdf**

(৮) আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩), আলাদাভাবে বিবর্তনতত্ত্বের আবিস্কারে অবদান রাখার জন্য ডারউইনের সাথে সাথে ওয়ালেসকেও কৃতিত্বের দাবীদার মনে করা হয়।

"Alfred Russel Wallace - Darwin began formulating his theory of natural selection in the late 1830s but he went on working quietly on it for twenty years. He wanted to amass a wealth of evidence before publicly presenting his idea. During those years he corresponded briefly with Wallace, who was exploring the wildlife of South America and Asia. Wallace supplied Darwin with birds for his studies and decided to seek Darwin's help in publishing his own ideas on evolution. He sent Darwin his theory in 1858, which, to Darwin's shock, nearly replicated Darwin's own." Available:

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0/history_14

(৯) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins)*The Blind Watchmaker*, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1987, (Preface). Translation of:

"It is almost as if the human brain were specifically designed to misunderstand Darwinism, and to find it hard to believe. …. our brains seem predisposed to resist Darwinism stems from our great success as creative designers. Our world is dominated by feats of engineering and works of art. We are entirely accustomed to the idea that complex elegance is an indicator of premeditated, crafted design. …. It took a very large leap of the imagination for Darwin and Wallace to see that, contrary to all intuition, there is another way and, once you have understood it, a far more plausible way, for complex "design" to arise out of primeval simplicity. A leap of imagination so large that, to this day, many people seem still unwilling to make it."

(১০) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 21.

(১১) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 215. Translation of:

"People are more unwilling to give up the word "God" than to give up the idea for which the word has hitherto stood."

(১২) মাইকেল রিউস, (Michael Ruse), Introduction to *Religion and Science*, by Bertrand Russell, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997.

(১৩) মাইকেল রিউসের ওয়েবসাইট

Available: **http://www.fsu.edu/~philo/new%20site/staff/ruse.htm**

(১৪) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 22.

(১৫) স্টিফেন গুল্ড, (Stephen J. Gould), *Nonoverlapping Magisteria*, The Unofficial Stephen Jay Gould Archive. Brief paraphrase of:

"I believe, with all my heart, in a respectful, even loving concordat between our magisteria—the NOMA solution. NOMA represents a principled position on moral and intellectua] grounds, not a mere diplomatic stance. NOMA also cuts both ways. If religion can no longer dictate the nature of factual conclusions properly under the magisterium of science, then scientists cannot claim higher insight into moral truth from any superior knowledge of the world's empirical constitution. This mutual humility has important practical consequences in a world of such diverse passions."

Available: **http://www.stephenjaygould.org/library/gould_noma.html**

(১৬) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), "When Religion Steps on Science's Turf The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy", Council for Secular Humanism. Brief paraphrase of:

"There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that all religious beliefs are outside the domain of science. On the one hand, miracle stories and the promise of life after death are used to impress simple people, win converts, and swell congregations. It is precisely their scientific power that gives these stories their popular appeal. But at the same time it is considered below the belt to subject the same stories to the ordinary rigors of scientific criticism: these are religious matters and therefore outside the domain of science. But you cannot have it both ways. At least, religious theorists and apologists should not be allowed to get away with having it both ways. Unfortunately all too many of us, including nonreligious people, are unaccountably ready to let them."

Available: **http://www.secularhumanism.org/library/fi/dawkins_18_2.html**

(১৭) তানবীরা তালুকদার, "*বিজ্ঞানের অঙ্গনে যখন ধর্মের প্রবেশঃ দুটো যৌক্তিক পার্থক্য কি এত সহজ?*" মুক্তমনা। Available: **http://www.mukto-mona.com/Articles/talukder/dhormo_pobeshDawkins.htm**

(১৮) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 16. Translation of:

"The men of science did not ask that propositions should be believed because some important authority had said they were true; on the contrary, they appealed to the evidence of the senses, and maintained only such doctrines as they believed to be based upon facts which were patent to all who chose to make the necessary observations. The new method achieved such immense successes, both theoretical and practical, that theology was gradually forced to accommodate itself to science."

(১৯) মোতাহার হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৯।

(২০) Jackson Dykman, "The Marketplace of Faith," *Time*, March 10, 2008, p. 41.

(২১) Available: **http://rrkelkar.wordpress.com/2007/07/28/gods-role-in-natural-disasters/**

(২২) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 243. Translation of:

"Whatever knowledge is attainable, must be attained by scientific methods; and what science cannot discover, mankind cannot know."

(২৩) অপবিজ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এই বইটার কথা, *The Bell Curve -Intelligence and Class Structure in American Life* - Herrnstein & Murray, New York: The Free Press, 1994। আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের বুদ্ধি কেন শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম এবং কেন তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবনতা বেশি তার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে এই বইটাতে পরিসংখ্যান বিদ্যার (অপ)ব্যাবহার করে। ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, কারণটা 'জেনেটিক'।

(২৪) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins),"The Great Prayer Experiment," *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 61.

(২৫) ফরিদ আহমেদ, "*প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?*" মুক্তমনা।

Available: **http://www.mukto-mona.com/Articles/farid_ahmed/prayer.pdf**

(২৬) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 251.

(২৭) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 10-11.

(২৮) মার্ক হউজার, (Marc Hauser), *Marc Hauser Discusses Moral Grammar*,

Available: **http://formsmostbeautiful.blogspot.com/2008/04/marc-hauser-discusses-moral-grammar.html**, and

Marc Hauser and Peter Singer, *Morality without Religion*, www.secularhumanism.org, Dec. 2005-Jan. 2006,

Available:
http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/HauserSinger.pdf

(২৯) অপার্থিব জামান, "*ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?*" মুক্তমনা।

Available: **http://www.mukto-mona.com/Articles/aparthib/noitikota_aparthib.pdf**

(৩০) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 361.

(৩১) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "রাজনীতি থাকবে সামনে, শক্তি থাকবে সংস্কৃতিতে,"

সমাজচিত্র, *দৈনিক সমকাল*, ২৪শে এপ্রিল, ২০০৮।

(৩২) অমর্ত্য সেন, (Amartya Sen), *Identity and Violence,* W. W. Norton & Company, Inc., 2006, New York, p. 112.

(৩৩) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 252. Translation of:

"New truth is often uncomfortable, especially to the holders of power; nevertheless, amid the long record of cruelty and bigotry, it is most important achievement of our intelligent but wayward species."

১৫ মে, ২০০৮

irtishad@gmail.com

ইরতিশাদ আহমদ পেশায় প্রকৌশলী।